HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০১ শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ
টপিক ০২: বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত
টপিক ০৩: বস্ত্র ও বয়ন শিল্প
টপিক ০৪: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি
টপিক ০৫: সিমেন্ট শিল্প
টপিক ০৬: সার শিল্প
টপিক ০৭: তৈরি পোশাক শিল্প
টপিক ০৮: ওষুধ শিল্প
টপিক ০৯: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী
টপিক ১০: বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক
টপিক ১২: শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
টপিক ১৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

শিল্প সভ্যতার বাহন। আদিকালেই মানুষ তার প্রয়োজনে প্রকৃতি থেকে আহরিত দ্রব্য অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করার জন্য শিল্পের গোড়াপত্তন করে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। হাতে কাটা চরকা শিল্পের স্থানে বৃহৎ কাপড়ের কল, কামারের পেটা লৌহের জায়গায় বৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কারখানা হলো শিল্পে অগ্রগতির ফল। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক দিক দিয়েও শক্তিশালী।

বাংলাদেশ শিল্পে একটি অনুন্নত দেশ। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত শিল্পকারখানাসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে আসে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষেও বেশ কিছু শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হয়। অতঃপর বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ১৯৮২ সাল হতে অলাভজনক কতিপয় শিল্পকারখানা বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পকারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগে শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং গড়ে তোলার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। শিল্পের স্থানীয়করণে যেসব অনুকূল নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে তা তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যায়। যেমন-

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

১. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors)

i. জলবায়ু (Climate): জলবায়ুর উপাদানগুলো (তাপ, চাপ, আর্দ্রতা) শিল্পের অবস্থানের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন- যেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা অধিক সেখানে কারখানা সচল রাখার জন্য যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ সহনীয় করার ব্যবস্থা করতে হয়। আবার তাপমাত্রা অধিক হওয়ায় শ্রমিকেরা কারখানায় বেশি সময় কাজ করতে না পারায় উৎপাদন কম হয়। এ কারণে উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলোতে শিল্প প্রসার লাভ করেনি। যেমন- মালদ্বীপ। পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে গড়ে উঠেছে। পশ্চিম ইউরোপের যুক্তরাজ্য, জার্মানি; উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা; এশিয়ার জাপান প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত হওয়ার প্রধান কারণ এখানে অনুকূল জলবায়ুতে শ্রমিকরা বেশি সময় কাজ করতে পারে।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

ii. কাঁচামাল (Raw Materials): শিল্প কারখানার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় কাঁচামালের। কারণ শিল্প উৎপাদন মানেই হলো কাঁচামালের রূপান্তর। পাট, আখ, চা ইত্যাদির উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাংলাদেশের পাট, চিনি ও চা শিল্প প্রসার লাভ করেছে। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে স্থানীয় রাবারের ওপর ভিত্তি করে রাবার শিল্প গড়ে উঠেছে।

iii. শক্তি সম্পদ (Energy Resources): শক্তি সম্পদের উপরও শিল্পের অবস্থান অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত যেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদ সরবরাহের সুযোগ রয়েছে সেসব স্থানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। যেমন- শক্তি সম্পদের অন্যতম উৎস কয়লা। তাই কয়লা খনির নিকটে হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সার কারখানা গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার কারণে। খনিজ তেল, কয়লা দূরবর্তী স্থানে বহন করে শিল্প স্থাপন ব্যয়বহুল বলে অনেক শিল্প, খনি এলাকাতেই গড়ে ওঠে। এজন্য যুক্তরাজ্য ও জার্মানির কার্পাস শিল্প, কয়লা খনি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, এ শক্তি সম্পদটি কঠিন ও ভারী বলে পরিবহন অসুবিধাজনক।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

iv. পানি সম্পদ (Water Resources): সাধারণত নদী, হ্রদ, ভূগর্ভস্থ পানি প্রভৃতির নিকটবর্তী স্থানে শিল্প কারখানাগুলো গড়ে উঠতে দেখা যায়। কারণ প্রতিটি শিল্পের জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে পানি। তাছাড়া শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরেও নদী ও সমুদ্র পথের প্রয়োজন হয়। এ কারণেই বৈদেশিক বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো নদী ও সমুদ্র বন্দরের সন্নিকটে গড়ে ওঠেছে। যেমন- চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় টিএসপি প্রজেক্ট, মেঘনা নদীর তীরে সিমেন্ট কারখানা ইত্যাদি।

v. ভগ্ন উপকূল রেখা (Broken Coast Line); ভগ্ন উপকূলরেখা বৃহৎ বন্দর স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানি নির্ভর শিল্প স্থাপনে সহায়ক। অনেক সময় কাঁচামাল না থাকলেও ভগ্ন উপকূলরেখার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৃহৎ শিল্পের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। জাপান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আকরিক লৌহ ও কয়লার পর্যাপ্ততা না থাকলেও বন্দরের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সুলভে আমদানির মাধ্যমে জাপান বিশ্বের একটি শীর্ষস্থানীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

২. অর্থনৈতিক নিয়ামক (Economic Factors)

i. মূলধন: শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। যেসব স্থানে ব্যাংক, অর্থবিনিয়োগকারী সংস্থা, ধনী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রভৃতির সমাবেশ থাকে সে স্থান শিল্প স্থাপনের অনুকূল বলে বিবেচিত।

ii. শ্রমিক: যেসব অঞ্চলে সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার সুবিধা থাকে সে অন্যলেই শিল্পকারখানা গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণত জনবহুল অঞ্চলে কারখানা স্থাপিত হলে শ্রমিক প্রাপ্তি সম্বন্দ্বে নিশ্চিত হওয়া যায়।

iii. বাজার: শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজারের নিকটে কিংবা বৃহদায়তন পণ্যের কারখানা বাজারের নিকটে স্থাপিত হওয়া বাঞ্চনীয়। নতুবা উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকে থাকা দূরহ হয়ে পড়ে।

iv. পরিবহন; কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন। শিল্পাঞ্চলের সাথে সড়ক, রেল ও পানিপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকলে শিল্পোন্নতি সহজসাধ্য হয়।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

৩. সাংস্কৃতিক নিয়ামক (Cultural Factors)

i. সরকারি নীতি: সরকারের শুল্কনীতি, লাইসেন্স প্রধান নীতি ইত্যাদির প্রভাব অনেক সময় শিল্পের উপর পড়ে। আবার অনেক স্থানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প গড়ে ওঠে। ঢাকার মসলিন শিল্প সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল।

ii. রাজনৈতিক অবস্থা: রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বা শান্তি-শৃঙ্খলার অভাবে অনেক সময় অনেক শিল্প নষ্ট হয়ে যায় বা শিল্প স্থাপনে বাধার সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সালের পর বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলনের কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্পের অনেক প্রসার ঘটেছে।

iii. ব্যবসায়িক সুনাম: অনেক সময় কোনো বিশেষ অঞ্চলের পূর্ববর্তী সুনামকে ভিত্তি করে সেখানে নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন- শেফিল্ডের ছুরি ও কাঁচি, সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, শিয়ালকোটের খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতির সুনাম বিশ্বজোড়া।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ

শিল্পের অবস্থান নির্ধারণ (Determining the Location of the Industry)

শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ে উল্লিখিত নিয়ামকগুলো বিবেচনায় সর্বাধুনিক সুবিধাজনক অবস্থান নির্বাচন করা হয়। শুধু কোনো একটি প্রাকৃতিক অথবা কেবল অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক নিয়ামক অনুকূলে থাকলেই শিল্প গড়ে ওঠে না; বরং একাধিক নিয়ামক বিবেচনা করে শিল্পের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। বিষয়টি বুঝতে আমরা শিল্পের অবস্থান নির্ধারণে ইংরেজি প্রবাদ "Iron moves to coal" এর দিকে দৃকপাত করতে পারি। 'ইস্পাত কয়লার দিকে যায়' এই প্রবাদটি বোঝায়, শিল্প এমন জায়গায় গড়ে উঠে যেখানে কাঁচামাল শুধু নয়জ্বালানিও সহজলভ্য। যেমন- ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠে কয়লার খনি বা কয়লা উৎপাদনের এলাকায়। কারণ এ শিল্পের কাঁচামাল লোহা হলেও ইস্পাত তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা (বিশেষত কোকিং কয়লা) দরকার হয়। ইস্পাত শিল্পে কাঁচা লোহা গলাতে প্রচুর জ্বালানি লাগে। কয়লা যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে কারখানা স্থাপন করলে জ্বালানি ও সেই সাথে পরিবহন খরচও কমে যায়। সেক্ষেত্রে, লোহা আকরিক এবং কয়লার খনির কাছাকাছি জায়গায় ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। যেমন- ভারতের জামশেদপুরে ইস্পাত কারখানা কয়লার খনি (রাঞ্চি, ধনবাদ) ও লৌহ আকরিকের খনি (ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম) এর মাঝে অবস্থিত; অ্যাপালাশিয়ান কয়লাক্ষেত্রের কাছাকাছি পিটসবার্গ, যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০২ বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industries)

বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে যেসব শিল্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র ও বয়ন শিল্প উল্লেখযোগ্য।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন (Worldwide Production and Distribution of Iron and Steel Industries)

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ভিত্তি লৌহ ও ইস্পাত। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যান্য অনেক শিল্পের ভিত্তি এই শিল্পের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সামান্য আলপিন বা সেফটিপিন থেকে শুরু করে বৃহদাকার জাহাজের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সব দ্রব্যই লৌহ শিল্পজাত। বিশ্বের যেসব দেশ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে উন্নতি লাভ করেছে সেসব দেশে এই শিল্প গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। কাঁচামালের সহজলভ্যতা, শক্তিসম্পদের প্রাচুর্যতা, জলবায়ু, মূলধন, শ্রমিক প্রাপ্তি, উন্নত বাজার ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি কারণে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। এই শিল্প সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে বিকাশ লাভ করেছে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

অবস্থান	লৌহ		অবস্থান	ইস্পাত	
	দেশ	পরিমাণ		দেশ	পরিমাণ
১	চীন	৮৪০	১	চীন	৯৯০
২	ভারত	৯৩	২	ভারত	১৫০
৩	জাপান	৬২	৩	জাপান	৮৫
৪	রাশিয়া	৫৪	৪	যুক্তরাষ্ট্র	৮১
৫	দক্ষিণ কোরিয়া	৪৪	৫	রাশিয়া	৭৫
৬	ব্রাজিল	২৭	৬	দক্ষিণ কোরিয়া	৬৪
৭	জার্মানি	২৩	৭	জার্মানি	৩৫
৮	যুক্তরাষ্ট্র	২২	৮	ব্রাজিল	৩৪
৯	ভিয়েতনাম	১৩	৯	ইরান	৩৩
১০	ইউক্রেন	৬	১০	তুরস্ক	৩২
	সমগ্র বিশ্ব	১৩০০		সমগ্র বিশ্ব	১৯০০

Source: US Geological survey, Mineral Commodity Summaries, 2025

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

১. চীন: চীন বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। আনশান চীনের সর্ববৃহৎ ইস্পাত কেন্দ্র। এছাড়া সাংহাই, নানকিং, উহান প্রভৃতি রাজ্যও ইস্পাত শিল্পে উন্নত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ব্যবহার করে ভারি যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি তৈরি করে চীন বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। ইয়াংসি নদীর তীরে হ্যাখ্যাও এবং লায়োনিং এর আনশান অঞ্চলে চীনের অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলো অবস্থিত।

২. ভারত: ভারত লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ। বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার কেওনঝাড়, কর্নাটকের বাবাবুদান প্রভৃতি অঞ্চলে আকরিক লৌহ এবং বিহারের ঝরিয়া ও বোকারা, পশ্চিমগঞ্জের রানীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে কয়লার আধিক্য থাকায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। দেশটির বিহারের সিংভূম জেলার জামশেদপুরে বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে।

৩. জাপান: জাপান বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ৩য় অবস্থানে রয়েছে। জাপানের প্রধান প্রধান লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো হলো- ওসাকা-কোবে অঞ্চল, টোকিও ইয়োকোহামা অঞ্চল, হোক্কাইডো-মুরোরান অঞ্চল। জাপানে এই শিল্পের মাধ্যমে বড় বড় জাহাজ, মোটরগাড়ি, ট্রাক্টর, সাইকেল, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, ক্যামেরা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

৪. রাশিয়া: রাশিয়া বর্তমান বিশ্বে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। রাশিয়ার ইউরাল অঞ্চলের ম্যাগনিটোগরস্ক রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উৎপাদনকারী কারখানা। রাশিয়ার কুজনেটস্ক অঞ্চলের গোরনারিয়া-শোরিয়া, নভোকুজনেস্ক, নভোসিবিরিস্ক ও বারনল, মস্কো ও টুলা অঞ্চলও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রসিদ্ধ।

৫. যুক্তরাষ্ট্র: দেশটি ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ এবং লৌহ উৎপাদনে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। দেশটির পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, স্প্যারোজ পয়েন্ট; পিটসবার্গের ইয়াংস্টাউন অঞ্চল; বৃহৎ পঞ্চ হ্রদ অঞ্চলের শিকাগো, গ্যারি, ব্যাফেলো, ক্লিভল্যান্ড, লোরেন, ইরি হ্রদের পশ্চিমে ডেট্রয়েট ইত্যাদি অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত দিয়ে মোটরগাড়ি, রেল ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৬. ব্রাজিল: ব্রাজিল লৌহ উৎপাদনে ষষ্ঠ অবস্থানে থাকলেও ইস্পাত উৎপাদনে দেশটি বিশ্বে অষ্টম। ব্রাজিলের ভোল্টা রেডোন্ডা, মনলিভাডা, বেলো ইরিজোন্টে প্রভৃতি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকাশ লাভ করেছে।

৭. দক্ষিণ কোরিয়া: বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। দেশটির ইনচন, ইয়েওংসান, গোয়াংজু, বুসান, সিউল প্রভৃতি অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

৮. জার্মানি: জার্মানি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বেশ অগ্রগামী। বর্তমানে দেশটি লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে। দেশটির শিল্প কেন্দ্রগুলো বুয়, এসেন, গর্টমন্ড, বোচম, জোসেলডর্ফ প্রভৃতি অণ্যলে গড়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত দেশগুলো ছাড়াও লৌহ শিল্পে ইউক্রেন, ভিয়েতনাম এবং ইস্পাত শিল্পে তুরস্ক, ইরান প্রভৃতি দেশ সমৃদ্ধি লাভকরেছে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিশ্ববাণিজ্য (International Trade of Iron & Steel)

বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাত বিশ্ববাণিজ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। উন্নত দেশগুলোতে লৌহ ও ইস্পাত অধিক উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এ সব দেশের চাহিদাও খুব বেশি। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি শীর্ষ ৪টি লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানিকারক দেশ। এছাড়াও ইউক্রেন, ইতালি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইস্পাত রপ্তানি করে থাকে। ইস্পাত আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, তুরস্ক, চীন শীর্ষে অবস্থান করছে। এছাড়াও নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরাক, শ্রীলঙ্কা, মিসর প্রভৃতি দেশগুলোও লৌহ ও ইস্পাত আমদানি করে থাকে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

লৌহের বাণিজ্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)*				ইস্পাতের বাণিজ্য (মিলিয়ন টন)**			
আমদানি		রপ্তানি		আমদানি		রপ্তানি	
দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
১. চীন	১৭৩.৬	১. অস্ট্রেলিয়া	৮০.৭	১. যুক্তরাষ্ট্র	২৮.৯	১. চীন	৬৮.১
২. জাপান	১৮	২. ব্রাজিল	২৮.৯	২. জার্মানি	২১	২. জাপান	৩১.৭
৩. দ. কোরিয়া	১২.১	৩. দ. আফ্রিকা	৬.৭	৩. ইতালি	২০.২	৩. দ. কোরিয়া	২৫.৫
৪. জার্মানি	৬.৯	৪. কানাডা	৬.৭	৪. তুরস্ক	১৭.৪	৪. জার্মানি	২২.৩
৫. ফ্রান্স	২.৪	৫. সুইডেন	৩.৭	৫. চীন	১৭.১	৫. তুরস্ক	১৮.০
সমগ্র বিশ্ব	২৪৭.৭	সমগ্র বিশ্ব	১৫৬.৯				

Source : * World Top Exports (WTEx)-2025 ** World Steel Association-2025

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব ও ব্যবহার (Importance and Uses of Iron & Steel)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজন সর্বাধিক। বিভিন্ন শিল্পের ভিত্তি এর ওপর নির্ভরশীল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্রব্যাদি সভ্যতা বিনির্মাণে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যবহারগুলো হলো-

১. লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা শিল্প কারখানার কাঠামো (Structure) নির্মাণ করা হয়। তাই এ শিল্পের উন্নতি ছাড়া অন্যান্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে পারে না।

২. শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশও এ সব কারখানায় তৈরি হয়।

৩. ঘরবাড়ি ও দালানকোঠার জানালা, দরজা, ছাদ ইত্যাদি নির্মাণেও লোহার রড ও পাত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম অর্থাৎ জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, লঞ্চ, বাস ইত্যাদির কাঠামো নির্মাণেও এর প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন: লৌহ ও ইস্পাত

৫. বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র তথা কামান, বন্দুক, রাইফেল, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ, বোমারু বিমান প্রভৃতি নির্মাণেও লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়।

৬. সংসারের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের বাসনকোসন, কান্তে, দা, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি নির্মাণে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

৭. হিটার, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার প্রভৃতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নির্মাণে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

৮. রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি যন্ত্রেও লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৩ বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

বস্তু ও বয়ন শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের স্থানীয়করণের নিয়ামক
(Factors of Textile and Weaving Industries Localization)

বস্ত্র ও বয়ন বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। পৃথিবীর প্রায় ৮৭-৯০ শতাংশ কাপড় কার্পাস তুলা থেকে উৎপাদন করা হয়। সকল দেশ বা সমাজের জনগণের নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের স্থানীয়করণের নিয়ামকসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) ভৌগোলিক, (খ) অর্থনৈতিক এবং (গ) রাজনৈতিক।

ক. ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ (Geographical Factors)

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলার সহজলভ্যতা, এ শিল্পের সমৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার। যেমন- ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে যে তুলা উৎপাদিত হয় তার ওপর নির্ভর করে মুম্বাই, আহমেদাবাদ, পুনে, সোনাপুর, জলগাঁও প্রভৃতি শহরে এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

২. অনুকূল জলবায়ু: বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রীভূতকরণে জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্দ্র জলবায়ু এ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের আর্দ্র জলবায়ুতে সুতা ছিঁড়ে যায় না। শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ুতে সুতা তৈরির কাজ ব্যাহত হয়। এ পরিবেশে সুতা ছিঁড়ে যায়। যেমন- কানাডা, রাশিয়া। তাই মধ্য এশিয়ার অনুকূল জলবায়ুতে তুলা উৎপাদক অঞ্চলে বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানে এ শিল্পের কেন্দ্রীকরণে জলবায়ুর প্রভাব বহুগুণে লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম আর্দ্রতা সৃষ্টি করে শুষ্ক জলবায়ুর কতিপয় দেশে এ শিল্পটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন-উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান।

৩. শক্তি সম্পদ: কার্পাস বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় শক্তি সম্পদের সহজলভ্যতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা, তেল, গ্যাস ও পানি হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি যেখানে সহজলভ্য সেখানে এ শিল্প সহজেই গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় শক্তি সরবরাহের ওপর নির্ভর করে আমদানিকৃত তুলার সাহায্যে শিল্পটি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। যেমন- শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা জাপানে এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

খ. অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ (Economic Factors)

১.শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা: শ্রমিক ছাড়া কোনো শিল্প কারখানাই চলতে পারে না। তাই বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীকরণেও শ্রমশক্তি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের কারণে ঘন বসতিপূর্ণ দেশগুলোতে এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। যেমন- ভারত, চীন।

২. পরিবহন ব্যবস্থা: কোনো স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠায় পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নতুন নতুন বয়ন শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে। যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাস বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার পিছনে সেখানকার উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ভূমিকা রেখেছে।

৩. বাজারের সান্নিধ্য: বাজার ব্যবস্থা এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কাঁচামালের অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র) ওপর নির্ভর করে বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

৪. উন্নত প্রযুক্তি: উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের উপর কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে এ শিল্পের উন্নতির কারণ প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান।

৫. মূলধন: বৃহদায়তন বয়ন শিল্প গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের প্রয়োজন হয়। কাজেই মূলধনের পর্যাপ্ততা এ শিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

গ. রাজনৈতিক নিয়ামকসমূহ (Political Factors)

১. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: এ শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অনেক সময় কোনো স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকার সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। যেমন- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় মসলিন শিল্প গড়ে উঠেছিল।

২. শিল্পনীতি: সরকারি শিল্পনীতি যেকোনো শিল্পের কেন্দ্রীকরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ সরকার নির্দিষ্ট স্থানে (রাজশাহী) শিল্পটি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া সরকার অনেক সময় এ শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে থাকে।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন
(Production and Distribution of Textile and Weaving Industries)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বয়ন শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করলেও এশিয়ার আর্দ্র জলবায়ুতে পোশাক তৈরির কাঁচামাল সুতা ছিড়ে না যাওয়ায় মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এ শিল্পের অধিক প্রসার ঘটেছে। বস্ত্র উৎপাদনে প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল ও পাকিস্তান রয়েছে।

দেশের নাম	পরিমাণ	দেশের নাম	পরিমাণ
১. চীন	৫৯৮০	৬. তুরস্ক	৮৮৭
২. ভারত	৫২০০	৭. পাকিস্তান	৮৫০
৩. যুক্তরাষ্ট্র	৩১৫০	৮. উজবেকিস্তান	৫৯০
৪. ব্রাজিল	৩০২০	৯. গ্রিস	৩০৫
৫. অস্ট্রেলিয়া	১২০০	১০. তুর্কেমিনিস্তান	২৯৯

Source: World Cotton Statisties Report; International Cotton Advisory Committee; 2023

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

১. চীন: এ শিল্পে চীন বিশ্বে প্রথম। দেশটিতে বছরে ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতি বস্ত্র উৎপাদিত হয়। স্থানীয় কাঁচা তুলা, সরকারি পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যাপক বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ বাজার, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহ, শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত প্রভৃতি এদেশে বয়ন শিল্পের সমৃদ্ধির মূলে কাজ করে। সিকিয়াং, ইয়াং-সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর উপত্যকার তুলা উৎপাদনকারী এলাকা জুড়ে দেশের বস্ত্র শিল্পগুলো বিস্তার লাভকরেছে। চীনের সাংহাই এ শিল্পের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। এ শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে তিয়েনজিন, নানকিং, কিলডাও, হ্যালচাও, ওস্কি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২. ভারত: ভারতে বার্ষিক ৫,২০০ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপাদিত হয়। সুতি বস্ত্র উৎপাদনে ভারতের অবস্থান প্রথম। দেশীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, পানিবিদ্যুৎ শক্তির পর্যাপ্ততা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার, সুলভ শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতি এ শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করেছে। ।। ভারতের সর্বত্রই বস্ত্র কলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেশটির বয়ন শিল্পগুলো কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, লুধিয়ানা, বারোদা, রাজকোট, ভাবনগর, সুরাট, নাগপুর, কোলাপুর, দিল্লি, আসানসোল এবং গোয়ালিয়রে কেন্দ্রীভূত। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর এদেশ যথেষ্ট কাপড় বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

৩. যুক্তরাষ্ট্র: সুতি বস্ত্র উৎপাদনে এদেশের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। নিউ ইংল্যান্ড রাজ্যের রোড আইল্যান্ডে ১৭৯০ সালে এদেশের প্রথম বস্ত্র কলটি স্থাপিত হয়। এদেশ বছরে গড়ে ৩২৫ কোটি বর্গমিটার বস্তু উৎপাদন করে। মেইন, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভার্মন্ট, ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট, নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড, কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে দেশের বস্ত্রকলগুলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এদেশ থেকে প্রচুর বস্ত্রাদি মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে রপ্তানি করা হয়।

৪. ব্রাজিল: তুলা উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান বিশ্বে চতুর্থ। দেশীয় তুলা, অভ্যন্তরীণ বাজার, দক্ষ শ্রমিক, সরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রভৃতি এদেশে বয়ন শিল্পের সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে। দেশটির শিজু, নিগ্রো নদী অববাহিকা অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

৫. অস্ট্রেলিয়া: উন্নতমানের তুলা উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং তুলার উপর নির্ভর করে ওয়ানগারাটা, ভিক্টোরিয়ায় বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত থাকলেও প্রযুক্তির উৎকর্ষে দেশটি বয়ন শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। দেশটি তুলা রপ্তানিতে ৩য়।

বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

উপরিউক্ত দেশগুলো ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে পাকিস্তান, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ কার্পাস তুলা উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। বস্ত্র শিল্পে বাংলাদেশ উন্নত হলেও এ শিল্পের কাঁচামাল (সুতা) উৎপাদনে দেশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাংলাদেশ জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হতে সুতা আমদানি করতে থাকে। তাই আলোচনা থেকে বলা যায়, বস্ত্র শিল্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে শিল্পোন্নয়ন। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৬৫ শতাংশ। বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি শিল্পে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে।

ঔপনিবেশিক সময় থেকে এদেশে চিনিকল স্থাপন শুরু হয়েছে। চিনি শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি শিল্প হলেও এ শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণসমূহ
(Geographic Factors of Sugar Industry Localization in Bangladesh)

বাংলাদেশে চিনি শিল্পের উন্নতির মূলে রয়েছে কতিপয় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব। নিচে এসব উপাদানসমূহের বিবরণ দেওয়া হলো:

প্রাকৃতিক উপাদান (Physical Elements)

১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আখ। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলায় প্রচুর আখ চাষ হয়। আখ উৎপাদনকারী এসব অঞ্চলে চিনি কলগুলো স্থাপিত হওয়ায় সহজেই কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলে আখের চাষ না হওয়ায় চিনি শিল্প গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

২.শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য: বাংলাদেশে চিনিকলগুলোতে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।
৩.জলবায়ু: বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে আখের ফলন ভালো হয়। ফলে এদেশে প্রতি বছর প্রচুর আখ চাষ হয়।

অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Elements)

১. মূলধন:চিনি শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। সরকার এ শিল্পের প্রায় সব মূলধনই সরবরাহ করে থাকে।
২. শ্রমিক সরবরাহ: কারখানায় কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় সুলভে বহু শ্রমিক পাওয়া যায়।
৩. পরিবহন ব্যবস্থা: কারখানাগুলোতে আখ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বাজারে চিনি প্রেরণের জন্য সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাও বাংলাদেশে বিদ্যমান।
৪.বাজার: বাংলাদেশে সর্বত্র চিনির চাহিদা ব্যাপক। ফলে কলগুলোতে উৎপন্ন চিনি বাজারজাত করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের উৎপাদন (Sugar Production in Bangladesh)

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে চিনি শিল্পের উৎপাদন খুবই কম ছিল। কারণ বেশির ভাগ চিনি শিল্প কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত চিনির উৎপাদন বিভিন্নভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

সাল	উৎপাদনের পরিমাণ	হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
২০১৫-১৬	৫৮,১৫১	(–) ৩৫.৬৯
২০১৬-১৭	৫৯,৯৮৪	(+) ৩.০৬
২০১৭-১৮	৬৮,৬০৩	(+) ১.১৪
২০১৮-১৯	৬৫,৩০২	(–) ১.০৯
২০১৯-২০	৮১,৭৬৮	(+) ২৫.২২
২০২০-২১	৪৮,০৮২	(–) ৪১.২০
২০২১-২২	২১,৪৮৬	(–) ৫৫.৩১

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

বাংলাদেশে বছরওয়ারি চিনি উৎপাদন কম-বেশি হয়ে থাকে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণ এর পিছনে ক্রিয়াশীল। ২০১৫-২০১৬ সালে ৫৮,১৫১ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়, যা ২০১৬-২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯,৯৮৪ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছায়। আবার ২০১৭-২০১৮ সালে চিনির উৎপাদন হয় ৬৮,৬০৩ হাজার মেট্রিক টন, যা ২০১৮-২০১৯ সালে হ্রাস পেয়ে ৬৫,৩০২ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছায়। এরূপ অস্থিতিশীল (হ্রাস-বৃদ্ধি) ধারা আজও বর্তমান। উপরের সারণিতে তা দেখানো হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৫.৩১ শতাংশ চিনির উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১,৪৮৬ হাজার মেট্রিক টনে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

চিনি শিল্পের বণ্টন (Distribution of Sugar Industries)

সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৫টি চিনিকল রয়েছে। এ চিনিকলগুলো ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগে অবস্থিত। ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করায় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে কোনো চিনিকল গড়ে উঠেনি। নিচে বিভাগ অনুসারে চিনি শিল্পের বণ্টন দেখানো হলো-

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

১. রাজশাহী বিভাগ: দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৫টি এ বিভাগে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের চিনিকলগুলো হলো জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস।

২. রংপুর বিভাগ: এ বিভাগে মোট ৫টি চিনিকল রয়েছে। সেগুলো হলো পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ এবং রংপুর সুগার মিলস।

৩. খুলনা বিভাগ: এ অঞ্চলে মাত্র ৩টি চিনিকল গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো কুষ্টিয়ার জগতি, কেরু এন্ড কোং ও মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস। তবে এসব চিনিকলের মধ্যে দর্শনার কেরু এন্ড কোম্পানি চিনি কলটি বেসরকারি খাতে নির্মিত। ১৯৩৮ সালে ব্যক্তিমালিকানায় নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এখানে চিনি ছাড়াও অ্যালকোহল, স্পিরিট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

৪. ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ: ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ আখ চাষের অনুকূল হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর আখ জন্মে। এ বিভাগ দুটিতে একটি করে চিনি কল আছে। এ কলগুলো হলো ফরিদপুর সুগার মিলস এবং জামালপুরের ঝিল বাংলা চিনিকল।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

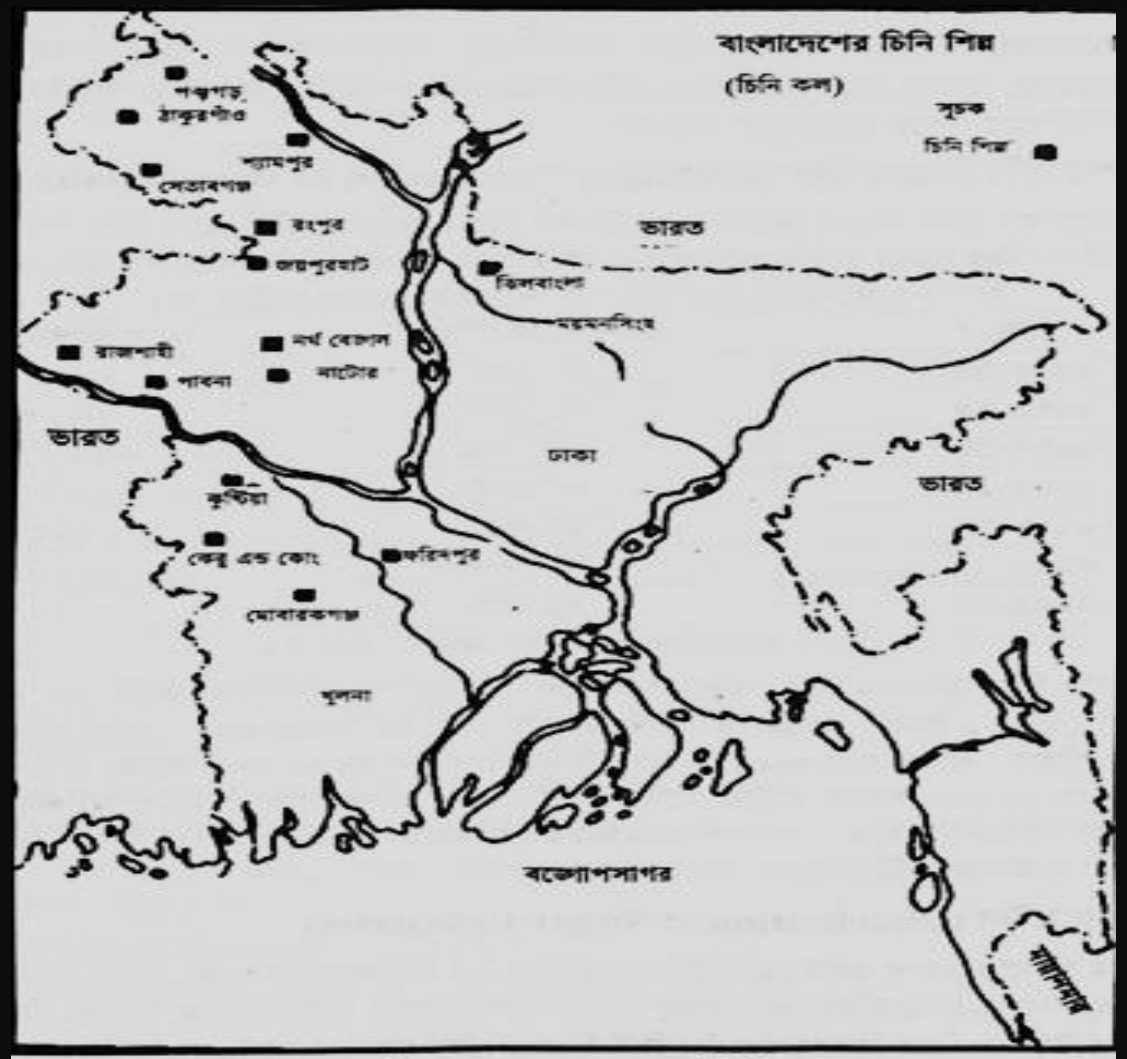

মানচিত্র-৬.২: বাংলাদেশের চিনি শিল্প

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

চিনি শিল্পের বাণিজ্য (Trade of Sugar Industries)

আখের অভাবে বাংলাদেশের চিনি কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপাদিত হয় না। বর্তমানে দেশের চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের ১৫টি চিনিকলের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক প্রায় ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন মাত্র। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন চিনিকলগুলোতে চিনির উৎপাদন খুবই সামান্য। এছাড়াও ২০২০ সালের ডিসেম্বর হতে রাষ্ট্রায়ত্ব ৬টি চিনিকল বন্ধ রয়েছে। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা দেশের ঘাটতি পূরণ করা হয়। দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার কিউবা, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হতে প্রচুর চিনি আমদানি করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

সাল	পরিমাণ (হাজার মেট্রিক টন)
২০১৬	২২৮৩
২০১৭	২০৯৭
২০১৮	২৬৫৪
২০১৯	২৪২৯
২০২০	২৩৯৭
২০২১	২৪৫০
২০২২	১৭০০*
২০২৩	১৫২৭*

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের সমস্যা (Probems of Sugar Industries in Bangladesh)

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও বিশেষ কতগুলো সমস্যা এ শিল্প প্রসারে বাধার সৃষ্টি করছে। যেমন-

১. চিনিকলগুলোর চাহিদার তুলনায় আখের উৎপাদন অনেক কম। বাংলাদেশের আখ উৎপাদনের মৌসুম মাত্র ৪-৫ মাস। ফলে চিনি কলগুলো বছরের প্রায় ৫-৬ মাস বন্ধ থাকে। কল বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের বেতন বহন করতে হয় বলে চিনির উৎপাদন খরচ অধিক হয়।

২. কোনো কোনো চিনিকল (ফরিদপুর সুগার মিলস) আখ উৎপাদন অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থান করায় পরিবহন ব্যয় বেশি হয়।

৩. কৃষকেরা উৎপাদিত আখের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পায় না বলে চিনিকলের নিকটবর্তী অঞ্চলে গুড় তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চিনির কলগুলোতে আখ সঙ্কট দেখা দেয়।

৪. এছাড়াও দেশে বিরাজমান লোডশেডিং এর কারণে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

চিনি শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Sugar Industries)

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ মেট্রিক টন চিনির প্রয়োজন। কিন্তু আখের অভাবে উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই এ শিল্পের উন্নতিকল্পে নিচে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন-

১. চিনি শিল্পের উন্নতির জন্য আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২. চিনিকলের নিকটবর্তী অঞ্চলে আখ চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় আখ বলয় হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় অনেক বেশি জমি আখ চাষের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৃষকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৪. চিনি কলগুলোতে আখ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রুতগামী পরিবহন ও রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা করতে হবে।

৫. উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ও চারা ব্যবহার করে আখ চাষ করতে হবে। এর ফলে আখ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প: চিনি

৬. আখের রস নিষ্কাশনে ও চিনি পরিশোধনে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। চিনি শিল্পে বিরাজমান সমস্যাবলি চিহ্নিত করে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রদান ও তাদের আখ চাষে অনুপ্রাণিত করতে পারলে দেশে আখ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে চিনি কলগুলোতে প্রচুর চিনি উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে করে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি কমে আসবে ও দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করাও সম্ভব হবে। তাই উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশে চিনি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৫ সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সিমেন্ট শিল্প

১৯৭১ সালের পূর্বে এদেশে সিমেন্ট শিল্প তেমন বিকাশ লাভ করেনি। তখন মূলত ছাতকেই কেবল সিমেন্ট উৎপাদিত হতো। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে এই শিল্প প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দেশীয় সিমেন্ট শিল্প কারখানার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মাল্টিন্যাশনাল সিমেন্ট কোম্পানি যেমন- হোলসিম, হাইডেলবার্গ, লাফাজ সুরমা, সিমেক্স ইত্যাদি এ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট শিল্প গড়ে ওঠার কারণ (Localization of Cement Industry)

সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠতে কাদামাটি, চুনাপাথর ইত্যাদি কাঁচামালের প্রয়োজন। এ কারণে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলগুলোতে সিমেন্ট কারখানা বেশি গড়ে উঠেছে। তবে জিপসাম, ক্লিংকার, ফ্লাইঅ্যাশ ইত্যাদি আমদানি করে এসব কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়।

সিমেন্ট শিল্প

বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের বণ্টন (Distribution of Cement Industries in Bangladesh)

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৮টি সিমেন্ট, কারখানায় মধ্যে ৩৪টি কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন জেলাতে এ কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে। নিচে বিভাগ অনুসারে সিমেন্ট শিল্পের বণ্টন দেখানো হলো-

১. চট্টগ্রাম বিভাগ: চট্টগ্রাম বিভাগে অনুকূল পরিবেশের জন্য কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম সিমেন্ট কারখানা ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানার বার্ষিক সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ৬ লক্ষ মেট্রিক টনের উপরে। চট্টগ্রাম বিভাগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারখানা হলো কনফিডেন্স সিমেন্ট কারখানা। এটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সীতাকুণ্ডে অবস্থিত। এছাড়া কুমিল্লার দাউদকান্দিতেও সিমেন্ট কারখানা রয়েছে।

২. খুলনা বিভাগ: এই বিভাগে খুলনা জেলার মোংলা বন্দরের নিকট মেঘনা সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। এটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানায় অন্যান্য উপাদানের সাথে বিদেশ থেকে খণ্ডপাথর আমদানি করে সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। এছাড়া মোংলা সিমেন্ট কারখানা হতে বছরে প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। এটাও ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিমেন্ট কারখানা যশোরে নির্মিত হয়েছে।

সিমেন্ট শিল্প

৩. ঢাকা বিভাগ: ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনা ঘাটের নিকট হোলসিম (১লা মার্চ ২০১৮ এটি লাফার্জ-হোলসিম নামে একীভূত হয়) সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। এটি ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন। পরবর্তীতে এখানে আরও বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। যেমন: ফ্রেশ সিমেন্ট কারখানা।

৪. সিলেট বিভাগ: সিলেটের সুনামগঞ্জের ছাতকে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাতক সিমেন্ট কারখানা। পূর্বে এই কারখানার নাম ছিল আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা। এই কারখানায় সুনামগঞ্জের টেকেরঘাট, বাগলিবাজার, ভাঙ্গারহাট, চরগা, লালঘাট প্রভৃতি স্থানের চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সুনামগঞ্জের আইনপুরে প্রায় ১৮ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ছোট আকৃতির আরেকটি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে।

৫. রংপুর বিভাগ: রংপুর বিভাগের জয়পুরহাট সিমেন্ট কারখানাটিতে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এতে স্থানীয় চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

সিমেন্ট শিল্প

মানচিত্র-৬.৩: বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্পের স্থানীয়করণ

সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট শিল্পের বাণিজ্য (Trade of Cement)

বাংলাদেশ কয়েক বছর পূর্বেও সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিশ্ব বাজার হতে সিমেন্ট ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল সিমেন্ট এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার সিমেন্টের বাজার রয়েছে। ২০১৮ সালে ৩ কোটি ১৩ লাখ টন সিমেন্ট বিক্রি হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে প্রায় ৯.৫৭ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সিমেন্ট রপ্তানি করেছে। গত বছর যা ছিল প্রায় ৭.২৬ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে সিমেন্টের বাজার ঊর্ধ্বমূখী। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে সিমেন্ট রপ্তানি করছে।

সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট শিল্পের সমস্যা (Problems of Cement Industries)

বাংলাদেশের সিমেন্ট অগ্রসরমান শিল্প হলেও এর বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে।

১. কাঁচামালের আমদানির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়;

২. পুরাতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও এগুলো সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে;

৩. বাজারজাতকরণ ও শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার ঘাটতি রয়েছে;

৪. বিদ্যুতের লোডশেডিং এর ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়;

৫. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব;

৬. বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ।

সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট শিল্পের সমস্যার সমাধান (Solution of Problems in Cement Industries)

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হলে বাধাসমূহ কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্প ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে-

১. সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল সুলভে আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে;

২. কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উৎপাদন বাড়াতে হবে;

৩. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে;

৪. শ্রমিক অসন্তোষ যাতে না ঘটে সে জন্য শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে;

৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

৬. অভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকারকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে;

৭. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৬ সার শিল্প

সার শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সার শিল্প

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতির জন্য সার অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। কেননা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা জরুরি। বাংলাদেশে জৈব সারের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে কৃত্রিম সারের ব্যবহার অনস্বীকার্য। বর্তমানে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন।

সার শিল্প

সার শিল্প স্থানীয়করণের কারণ (Factors of Fertilizer Industry Localization)

বাংলাদেশে সার শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ হলো-

১. পর্যাপ্ত কাঁচামাল: প্রাকৃতিক গ্যাস সার শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল, যা দেশেই উত্তোলিত হচ্ছে;

২. অনুকূল জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ু সার শিল্পের উপযোগী;

৩. শক্তি সম্পদের সহজলভ্যতা: প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সার শিল্প বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

৪. সার শিল্পের সরকারি ভর্তুকি ও মূলধন সরবরাহ;

৫. ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা;

৬. সুলভ ও তুলনামূলক সস্তা শ্রমিক;

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সার শিল্প

সার শিল্পের উৎপাদন (Production of Fertilizer Industry)

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে ফেজুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল সার কারখানায় সার উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম ছিল। ১৯৭১ সালের পর অনেক সার কারখানা গড়ে উঠে। এই শিল্পের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় বার্ষিক অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২,৫০০ টন এবং ইউরিয়া ১.১৭ লক্ষ টন। ঘোড়াশাল সার কারখানায় বার্ষিক ইউরিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন। ২০২১-২০২২ সালে বাংলাদেশে সার উৎপাদনের পরিমাণ ১১, ৯৭, ১১৭ মেট্রিক টন।

সাল	উৎপাদন
২০১৮-১৯	৯,২০,৭৫৪
২০১৯-২০	৯,৭৬,১৫৭
২০২০-২১	১,২৯৬,০০৮
২০২১-২২	১,১৯৭,১১৭

সার শিল্প

সার শিল্পের বণ্টন (Distribution of Fertilizer Industry)

বাংলাদেশের সার শিল্পের বণ্টন নিচে বিভাগ অনুসারে দেখানো হলো:

১. ঢাকা বিভাগ: ঢাকা বিভাগে নরসিংদীর ঘোড়াশাল সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুরের সরিষাবাড়ি থানার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা অবস্থিত। এদের মধ্যে ঘোড়াশাল সার কারখানা ১৯৭০ সালে নির্মিত হলেও এর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে। পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা ১৯৮১ এবং যমুনা সার কারখানা ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি সার কারখানাতে কাঁচামাল হিসেবে তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

২. চট্টগ্রাম বিভাগ: এই বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আশুগঞ্জ সার কারখানা, চট্টগ্রামে ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) সার কারখানা ও চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা গড়ে উঠেছে। আশুগঞ্জ সার কারখানা ১৯৮১ সালে, টিএসপি সার কারখানা ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সার কারখানাগুলোর কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৩. সিলেট বিভাগ: এই বিভাগের সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, অ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানা, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সার কারখানা উল্লেখযোগ্য। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেশের প্রথম। এখানে কাঁচামাল হিসেবে হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানা ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার উদ্বৃত্ত অ্যামোনিয়া কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। হবিগঞ্জ সার কারখানা হবিগঞ্জের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে সার উৎপাদন করে।

সার শিল্প

বাংলাদেশের সার কারখানা		বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (হাজার মেট্রিক টন)
নাম	উৎপাদিত সার	
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	ইউরিয়া	৫৬১
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লিমিটেড	SSP, ASP	১০০
কাফকো (কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কো. লিমিটেড)	ইউরিয়া	-
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	ইউরিয়া	৫২৮
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	ইউরিয়া	৯৫
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড	ইউরিয়া	৫৬১
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	ইউরিয়া	৫৬১
ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	DAP	৫২৮
শাহজালাল সার কারখানা লিমিটেড	ইউরিয়া	৫৮১

সূত্র: বিসিআইসি ২০২৩।

সার শিল্প

সার শিল্পের সমস্যা (Problems of Fertilizer Industries)

১. কাঁচামালের ঘাটতি: সার শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে অধিকাংশ কারখানা ক্ষমতা অনুযায়ী সার উৎপাদন করতে পারে না।

২. শক্তি সম্পদের অপ্রতুলতা: কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতার দরুন নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

৩. যন্ত্রপাতির অভাব: প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব সার শিল্পের অন্যতম সমস্যা।

৪. দক্ষ শ্রমিকের অভাব; এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের অধিকাংশ অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং অদক্ষ।

৫. মূলধনের অভাব: দেশে মূলধনের অভাবের কারণে বিদেশ থেকে সময়মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হয় না।

৬. বিবিধ কারণ: প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা, অব্যবস্থাপনা, সততার অভাব, দুর্নীতি, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব প্রভৃতি সার শিল্পের উন্নতিতে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

সার শিল্প

সার শিল্পের সমস্যার সমাধান (Solution of Problems in Fertilizer Industries)

বাংলাদেশের সার শিল্পের সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান হলো:

১. প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা;

২. সার শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৩. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ;

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ;

৫. দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন;

৬. উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

৭. সঠিক শিল্পনীতি প্রণয়ন।

উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের সার শিল্পের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৭ তৈরি পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

তৈরি পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক শিল্প প্রায় একক খাত হিসেবে অবদান করছে। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ সালে মোট রপ্তানির প্রায় ৮৬.৫৫% আসে এই খাত থেকে।

তৈরি পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশের ইতিহাস (History of Growing Garment Industries)

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। ১৯৬০-এর দশকের দিকে এদেশে প্রথম তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপিত হয়। স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই এটি গড়ে ওঠে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ১৯৫০-এর দশকে উন্নত দেশসমূহে শ্রমিক ইউনিয়ন উচ্চ মজুরির দাবিতে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঐ সময় তারা শ্রমিকদের নিম্ন মজুরির বিনিময়ে এ শিল্পখাতকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হংকং, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থানান্তর করে। পরবর্তীকালে উন্নত দেশগুলো MFA (Multi Fibre Agreement)-এর মাধ্যমে উচ্চ রপ্তানিযোগ্য দেশগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে। তখন উৎপাদনকারীরা আরও কম মজুরির দেশে এ শিল্পকে স্থানান্তর করে। এরই ফলে বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ লাভ করে এবং উৎপাদন শুরু করে।

১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে মাত্র ৫০টি কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালে এর সংখ্যা ছিল ৩৮৪টি। ২০০০-২০০১ সালে এ সংখ্যা উত্তীর্ণ হয় ৩৪৮০ টিতে এবং বর্তমানে এ শিল্পের কারখানা সংখ্যা ৪৬২১টির অধিক (সূত্র- BGMEA-2023)।

তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার কারণ (Localization of Garment Industries)

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশ লাভ করেছে, যথা-

১. প্রাকৃতিক কারণ

i. অনুকূল জলবায়ু: বাংলাদেশের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে শ্রমিকরা অধিক সময় কারখানায় কাজ করতে পারে। তাছাড়া পোশাক শিল্পের জন্য কাপড় তৈরিতেও এ জলবায়ু সহায়ক।

ii. কাঁচামাল: দেশি ও বিদেশি মিলগুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা বস্ত্র সংগ্রহ করে থাকে।

iii.শক্তিসম্পদ: পর্যাপ্ত শক্তিসম্পদের আধিক্য বাংলাদেশে পোশাক শিল্প গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

তৈরি পোশাক শিল্প

২. অর্থনৈতিক কারণ

i. মূলধন: বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো থেকে পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা থাকায় মূলধনের কোনো অসুবিধা হয় না।

ii. শ্রমিক: জনবহুল এদেশে সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকের মজুরি অনেক কম। ফলে শ্রমিকের সহজলভ্যতার কারণে এদেশে প্রচুর তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে ওঠেছে।

iii. পরিবহন: সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সুবিধা রয়েছে।

iv. বাজার: বিদেশে বাংলাদেশি পোশাকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাণিজ্য (Export Trade of Garment Products)

বাংলাদেশ প্রতি বছর তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতেও তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানিকৃত পণ্যগুলো হলো শার্ট, পায়জামা, ট্রাউজার, জ্যাকেট, জিন্স প্যান্ট, পুলওভার, নাইট ড্রেস, শীতকালীন পোশাক, গেঞ্জি, সোয়েটার, গ্লোভস ইত্যাদি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৪৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ৮৬.৫৫ শতাংশ। শুরুর দিকে ১৯৮৩-৮৪ সালে যা ছিল মোট রপ্তানির মাত্র ৩.৮৯ শতাংশ।

তৈরি পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা (Problems in Garment Industries)

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাগুলো হলো-

১. কাঁচামাল আমদানি: বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পসমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশি বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। এতে করে দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারকদের খরচ বেড়ে যায়।

২. দক্ষ শ্রমিকের অভাব: বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো দক্ষ শ্রমিকের অভাব। বাংলাদেশে বিভিন্ন গার্মেন্টসে যে শ্রমিক কাজ করে তাদের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগই অশিক্ষিত, আধাদক্ষ বা অদক্ষ মহিলা।

৩. মুষ্টিমেয় কয়েক শ্রেণির পোশাক রপ্তানি: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো মুষ্টিমেয়

কয়েক প্রকার তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভরশীলতা। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১১৫ প্রকার তৈরি পোশাকের চাহিদা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাত্র ১০ থেকে ১৫ প্রকার পোশাক তৈরি হয়। বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের বহুমুখীকরণের অভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তৃতি লাভ করতে পারছে না।

তৈরি পোশাক শিল্প

৪. আমদানিকারক কর্তৃক কোটা আরোপ: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো আমদানিকারক বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির ওপর কোটা আরোপ করে। ফলে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে সংকট দেখা দেয় এবং অনেকগুলো ছোট ছোট পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়।

৫. রপ্তানি ক্ষেত্রে বিলম্ব: আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ বিদেশ থেকে সুতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব, শুল্ক জটিলতা প্রভৃতি কারণে সময়মত পোশাক সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আমদানিকারকগণ তাদের অর্ডার নাকচ করে দেয় এবং রপ্তানি বিঘ্নিত হয়।

৬. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশ বেশ কিছু রপ্তানিকারক দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। চীন, ভারত, হংকং, সিংগাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ তৈরি পোশাক শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে এসব দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাক শিল্প উন্নয়নের উপায় (Ways to Develop Garment Sector)

১. মজুরি প্রদান: বাংলাদেশে শ্রম আইন অনুযায়ী পোশাক শিল্পে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস নির্ধারিত। তবে বাংলাদেশের অনেক পোশাক কারখানাতেই অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয়। এই অতিরিক্ত কাজের মজুরি প্রদান করতে হবে। এছাড়া নারীদেরকে পুরুষদের সমান মজুরি প্রদান করতে হবে। তাতে নারীরা কাজে উৎসাহী হবে ও পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে।

২. কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ: পোশাক কারখানাগুলোতে কাজের পরিবেশ উন্নত করতে হবে। কারখানায়

পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। আপদকালীন সময়ে দ্রুত বাইরে বের হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া কারখানার ভিতরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাতে পোশাক কর্মীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমবে ও কর্মস্পৃহা বাড়বে।

৩. বেতন-ভাতা প্রদান; পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ভাতা, ক্ষতিপূরণ, বোনাস ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে অধিক মহিলা কর্মী পোশাক শিল্পে যোগদান করবে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

তৈরি পোশাক শিল্প

৪. নারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি: পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলারা অদক্ষ হওয়ার কারণে কম মজুরিতে কাজ করে। যদি তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ দেওয়া যায়, তবে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৫. প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তি: শিল্প ঋণ প্রাপ্যতা পোশাক শিল্প বিকাশের আরেকটি কারণ। বিনিয়োগ ও উৎপাদন ব্যবধানের স্বল্পতার কারণে ও দ্রুত উৎপাদন ব্যয় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দ্রুত ও সহজশর্তে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রবাহ আরও বাড়াতে হবে।

৬. শিল্পনীতির বাস্তবায়ন: বাংলাদেশে পোশাক শিল্প উন্নয়নে সরকারের উদার শিল্পনীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। বর্তমান সরকার বেসরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করছে। তৈরি পোশাক শিল্প মূলত বেসরকারি খাতেই গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার কর রেয়াত, নিম্ন সুদের হার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকার তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সচেতন করতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইপিজেড (EPZ- Export Processing Zones) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আগামী বছরগুলোতে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আরো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ০৮ ওষুধ শিল্প

ওষুধ শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ওষুধ শিল্প

চিকিৎসা সেবার একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ ওষুধ। বর্তমান বিশ্বে ওষুধ অন্যতম বৃহত্তম এবং লাভজনক শিল্প। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উদীয়মান শিল্প খাত হিসেবে চিহ্নিত। অনেক সংকটের মধ্য দিয়েও এই শিল্প সুষ্ঠু বিকাশ ও মানসম্মত উৎপাদনশীলতার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণে এই শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বর্তমান অবস্থা
(Present Situation of Medicine Industry in Bangladesh)

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো জাতীয় ওষুধ নীতি। ১৯৮২ সালে কার্যকর হওয়া এই নীতির উদ্দেশ্য বাজার থেকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ অপসারণ করে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ ন্যায্যমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই নীতির ফলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর পর রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৯৬ শতাংশ ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। বর্তমানে ৫৪টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় ১৫৭ টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ৮৯০৩.৯৬ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি করেছে।

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশের ছোট-বড় নিবন্ধিত ওষুধ কোম্পানির সংখ্যা ২৫৭টি। এদের মধ্যে প্রধান ৫৪ টি কোম্পানি ১৯৯০ সাল থেকে সিংহভাগ (৮৫%) ওষুধ রপ্তানি করে আসছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান হতে উৎপন্ন প্রায় ১৮০০ শ্রেণির ওষুধের মধ্যে প্রায় ৩০০ প্রকার ওষুধ বিশ্ব বাজারে রপ্তানি হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে এন্টিবায়োটিক, এনালজেসিক, কন্ট্রাসেপ্টিক, স্টিমুলেন্ট, ভিটামিন, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট, হার্বাল ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ রয়েছে। ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের দুটি ওষুধ কোম্পানি যথা- স্কয়ার এবং বেক্সিমকো ফার্মা FDA কর্তৃক ওষুধ রপ্তানির অনুমোদন প্রাপ্ত (Intelicetul property rights)। ইনসেপ্টা ফার্মাও এ অনুমোদনের আশা করছে। FDA (US Food and Drugs Administration) কর্তৃক এ স্বীকৃতি দেশের ওষুধ রপ্তানি আয়কে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। ফার্মাসিউটিক্যালসের কোনো প্রোডাক্ট ডাক্তার, ওষুধ বিক্রেতা ও ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হলে তা বিনিয়োগকারীর ব্যাপক লাভের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। মানবসেবার মহান ব্রত ছাড়া শুধু অর্থনৈতিক লাভ কিংবা নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থকে কেন্দ্র করে চলাটা এ শিল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নয়। ওষুধ শিল্পদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ইতিবাচক মনোভাব এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুততার সাথে এই শিল্পের বিস্তৃতি লাভকে সহজ করেছে।

ওষুধ শিল্প

সাল	মোট রপ্তানি	যতটি দেশে রপ্তানি করে
২০১৮	৩৫১৪.২৮	১৪৬
২০১৯	৪০৯০.০৯	১৪৭
২০২০	৪১৫৫.৪৭	১৫১
২০২১	৬৫৭৫.৮০	১৪৮
২০২২	৬৬৩৭.৭০	১৫৭
২০২৩	৮৯০৩.৯৬	১৫৭

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে করণীয় (Steps to Follow in Medicine Sector)

ওষুধ শিল্পের সাথে জড়িতদের WHO (world Health Organization) কর্তৃক স্বীকৃত ওষুধ তৈরির উত্তম পদ্ধতি CGMP (Current Good Manufacturing Practices) এর নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। ওষুধ কোম্পানির আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএফপিএমএ (IFPMA-International Federation of Pharmaceuticals Manufactureres Association) এর নির্দেশনার ব্যাপারেও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। WHO-এর শীর্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও পূর্ণ মনোযোগ থাকতে হবে।

ওষুধের কাঁচামালের বেশিরভাগ (প্রায় ৭০ শতাংশ) বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কাঁচামাল দেশেই তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। দ্রুত এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপন করা হলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পখাত আগামী ৫ বছরে তৈরি পোশাক শিল্পের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা রয়েছে। সুতরাং, এলোপ্যাথিক ওষুধের পাশাপাশি ভেষজ ওষুধও তৈরি করা যায়। দেশের বেশিরভাগ মানুষ গরীব হওয়ায় বেশি দামে ওষুধ ক্রয় করা সম্ভবপর হয় না। পুরো ডোজ শেষ না করেই তারা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা দরকার। ওষুধ শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হলে মানবতার কল্যাণে এ শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব।

ওষুধ শিল্প

বিশ্বায়নের এই যুগে ওষুধ শিল্প একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে ওষুধ বেচাকেনায় যোগ দিতে পণ্যের সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণ রপ্তানির পূর্বশর্ত। তাই পণ্য গুণে ও মানে এমন হবে যে প্রচারে ও প্রসারে বাংলাদেশ থাকবে সামনের সারিতে। বিদেশে এদেশের ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এর গুণগতমান পরীক্ষার পদ্ধতি অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পকে বিদেশে উপস্থাপন করতে ওষুধ শিল্প প্রদর্শনী মেলা বেশি বেশি করা জরুরি। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধে ভেজাল থাকার কারণে অনেক রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এসকল ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ
(Medicne Industry of Bangladesh and Future Challanges)

দিনে দিনে ওষুধের জন্য ব্যয় বাড়ছে। ওষুধ কেনার ক্ষমতা সবার সমান নয়। এক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। উন্নত দেশগুলো উৎপাদিত ওষুধের ৮৬% ব্যবহার করে, যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো ব্যবহার করে ১৪% ওষুধ। অথচ জনসংখ্যার মাত্র ২৫% মানুষ বসবাস করে উন্নত দেশে আর ৭৫% বাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

ওষুধ শিল্প

পৃথিবীতে যে তিনটি ব্যবসা সবচেয়ে বেশি অর্থ এনে দেয় তার মধ্যে ওষুধ সবার উপরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি শিল্পের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। ওষুধ মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অবদান। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কৃত পেনিসিলিন কিংবা গুটি বসন্ত, পোলিওসহ বিভিন্ন রোগের টিকা অথবা আমাদের ICDDRB (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh) আবিষ্কৃত খাবার স্যালাইন পৃথিবীর কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করছে। সবচেয়ে জনপ্রিয়, দ্রুত বর্ধনশীল, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সেবামূলক এই শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কর্মক্ষম সুস্থ সবল জাতি গঠনে অবদান রাখতে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – খনিজ ও শক্তি সম্পদ

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

বাংলাদেশে প্রায় চার যুগ পূর্বে (সত্তরের দশকের শেষে এবং আশির দশকের শুরুতে) গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে প্রচুর নারী কাজ করছে। কালক্রমে নারী এই শিল্পের প্রধান শ্রম শক্তি হয়ে ওঠেছে। কিশোরী থেকে তিরিশোর্ধ পর্যন্ত নারীদের এখানে নিয়োগ দেয়া হয়। অভাব অনটনে জর্জরিত নারীরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয় তার জীবন জীবিকা রক্ষার তাগিদে। তবে সবার চাকুরীর স্থায়ীত্ব বা বেতনের নিশ্চয়তা নেই। মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চাকুরী থাকবে কি থাকবে না। গার্মেন্টস এ নারীদের শ্রমের অবমূল্যায়ন করা হয়। একই কাজে নারীদের তুলনায় পুরুষের বেতন বেশি ধরা হয়। এই বিকাশমান শিল্পে নারী শ্রমিকরা ছুটি পায় রাত ৮ টার পর। অনেক সময় রাস্তা-ঘাটে এরা বিপদের সম্মুখীন হয়। গার্মেন্টস এ ছুটির নিয়ম সরকারি ছুটির নিয়ম নীতির বাইরে। এ অবস্থা কর্মজীবী নারীর শিল্প ও পরিবারের জন্য অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

নির্ধারিত ছুটিতে তাদেরতো ন্যায়সংগত অধিকার আছে। তবে আইন কানুনের কথা বললে চাকুরী টিকে থাকে না। এই ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে না। উপরন্তু সামাজিকভাবে নারীর মূল্যায়ন কম বলে নারীর শ্রম বাজারও সস্তা। এক সময় মালিকরা গ্রাম-গঞ্জ থেকে নারীদের এনে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেন। ফলে গার্মেন্টস শিল্প উত্তরোত্তর বিকশিত হয় এবং নারীরা উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু তাদের জীবন চলে অতিশয় সংকটের মধ্যে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকের যে মজুরি তা জীবন ধারণের জন্য অপ্রতুল। তার উপর নারী শ্রমিদের বেতন পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক অংশে কম। আর তারই সুযোগে শিল্প মালিকরা স্বল্পমূল্যে নারী শ্রমিকদের দিয়ে পরিচালিত করে তাদের শিল্প-কারখানাগুলো। গড়ে তোলে নারীর জন্য সস্তা শ্রম বাজার। যখন বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে পোশাক শিল্পে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলছে, সাফল্যের এমন সময় পোশাক শিল্পের মূল চালিকা শক্তি যে শ্রমিক তাদের জীবন জীবিকার মান খুবই নিম্ন। শিল্প বিকাশের নামে প্রতিনিয়ত চলছে শ্রমিক নির্যাতন। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ তাজরীন ফ্যাশন, রানা প্লাজা, ট্যাম্পাকো, ফুজি নীটওয়্যারসহ শত শত নাম। আর তার সাথে জড়িত সহস্র শ্রমিকের রক্ত ও জীবনের অগ্নিদগ্ধ চিত্র। মালিকের এই নির্মমতা আরও নগ্ন হয় নারী শ্রমিকের বেলায়। শ্রমিকেরা যে মজুরি পায় তাতে তাদের জীবনধারণ তথা পরিবারের অন্য সদস্যদের চালানো অত্যন্ত কঠিন ও পীড়াদায়ক হয়। তার পরেও জীবনধারণের তীব্র প্রয়োজনে সকল সংকট মোকাবেলা করেও তারা গার্মেন্টস শিল্পে শ্রম দান করে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

দেশের প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে যাই কিছু বলা হয়ে থাকুক না কেন সেই সুযোগ লাভেরও পরিবেশ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমান নয়। সরকার আইন করে গর্ভধারিণী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় ছয় মাস নির্ধারণ করলেও তা ভোগ করার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ নারী শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়। কারণ যখনই কারখানা কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন যে কোনো নারী শ্রমিক অন্তঃস্বত্তা সুকৌশলে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। শ্রমিকদের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ না থাকায় তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। ফলে মালিক পক্ষ সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। শ্রম আইনে নারী শ্রমিকের জন্য ওভার টাইম করানোর নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারিত থাকলেও নারী শ্রমিকদের নির্বিচারে ওভার টাইম করানো হয়। এই বিষয়ে আইনসিদ্ধ কোনো নিয়ম মানার বালাই গার্মেন্টস শিল্পে নাই। বিশেষত ওভার টাইম করানোর পরেও শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে মালিকের পক্ষের ম্যানেজমেন্ট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সততার পরিচয় দেয় না। অথচ গার্মেন্টস মালিকরা বলে থাকেন, নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে মনোযোগী এবং কাজও ভালো করেন। পারিশ্রমিকও কম দিয়ে কাজ করানো যায়।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মী

তাই সব দিক থেকে নারী শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো সুবিধাজনক। আর এজন্যই গার্মেন্টস শিল্পে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীদের ভূমিকা অসীম।

সুপারিশ: বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীদের যথাযথ সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরো দক্ষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রম আইন মেনে চলা ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতি জরুরি। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প উন্নয়ন ও পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও মানবাধিকার কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ১০ বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

বাংলাদেশের শিল্পসমূহ (Industrial Sectors of Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শিল্পের অবদান খুব সামান্য হলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, ২০২২-২৩ সালে GDP তে শিল্পের অবদান ৩৬.৯২ শতাংশ। বাংলাদেশের শিল্পকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

যথা- (১) ক্ষুদ্র শিল্প; (২) মাঝারি শিল্প; (৩) বৃহৎ শিল্প।

১. ক্ষুদ্র শিল্প: বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুসারে, যে শিল্প কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জন বা তার চেয়ে কম তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। স্বল্প পুঁজি, অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে একক মালিকানা, অংশীদারিত্ব অথবা সমবায়ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলো হলো; রেশম, চামড়া, বিড়ি, লবণ, তাঁত, অলঙ্কার, আসবাব শিল্প ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

২. মাঝারি শিল্প: বাংলাদেশের কারখানা আইন অনুযায়ী, যেসব শিল্পে ২০ জনের বেশি কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে। এ শিল্পে বৃহৎ শিল্পের মতো আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্পগুলো হলো: নাইলন, সাবান, দিয়াশলাই, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ইত্যাদি।

৩. বৃহৎ শিল্প: যে সকল শিল্পে ২৩০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। এ শিল্পে বড় পরিসর, অধিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত কৌশল দরকার হয়। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে পাট, কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, সার ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

ভারতের শিল্পসমূহ (Industrial Sectors of India)

ভারত শিল্পে উন্নত। বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরে ভারতকে তৃতীয় দেশ হিসাবে ধরা হয়। ভারতের মোট জিডিপির দুই-তৃতীয়াংশ আসে শিল্পখাত থেকে। ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পসমূহ হলো- পোশাক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, রাসায়নিক, সিমেন্ট, স্টিল ও ইস্পাত, সফটওয়ার, খনিজ ও পেট্রোলিয়াম শিল্প। এছাড়াও ভারতের অন্যান্য শিল্পগুলো হচ্ছে কৃষি, মোটর, সিনেমা, স্বর্ণ শিল্প ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা
(Comparison of Industrial Sectors of Bangladesh and India)

১. পাট শিল্প: স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প ছিল পাট। পৃথিবীর সর্বপ্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের উৎপাদিত পাটের ওপর নির্ভর করে সে সময় কলকাতায় ১০৮টি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পাট শিল্পে বেশ উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের আওতাধীন ১৩টি ছোট, ৭টি মাঝারি ও ৬টি বৃহৎ পাটকল রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা ২৮১টি।

২. চা শিল্প: বাংলাদেশ চা শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পর্যাপ্ত পরিমাণ চা বাগান এদেশের চা শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতেও চা শিল্প ১৭২ বছর আগে থেকে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

৩. চিনি শিল্প: বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও চিনি শিল্প সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি। দেশটি বর্তমানে চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাংলাদেশে ১৫টি চিনি কল থাকলেও ইক্ষুর অভাবে কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না। ফলে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হয়। অপরপক্ষে, ভারত চিনি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। ভারতে সর্বমোট ৩১৮টি চিনির কল আছে।

৪. সিমেন্ট শিল্প: বাংলাদেশে সিমেন্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২৩টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছু রপ্তানিও করছে। ভারতে ১০টি বৃহৎ সিমেন্ট প্লান্ট এবং প্রায় ৩০০টি ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট আছে। সিমেন্ট উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৮৬ মিলিয়ন টন।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

৫. সার শিল্প: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং আগের তুলনায় বর্তমানে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। ফলে দেশের চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণ সার আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে ৯টি সার কারখানা রয়েছে। ভারত সার শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। গত ৫০ বছর ধরে ভারত সার উৎপাদন করে আসছে এবং সার উৎপাদনে ভারত বিশ্বে তৃতীয়।

৬. লৌহ ও ইস্পাত শিল্প: যেকোনো শিল্পে লৌহ ও ইস্পাতজাত শিল্পপণ্যের ব্যবহার রয়েছে। শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরিতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি। অন্যদিকে, ভারত লৌহ শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। গত ৪০০ বছর ধরে ভারতে লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বর্তমানে ভারত এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ২য় স্থানের অধিকারী।

৭. পোশাক শিল্প: বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিভিন্ন গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশে ৪,৬২১ টির অধিক পোশাক কারখানা রয়েছে। ভারতও পোশাক শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। তবে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্প ব্যাপকতর অবদান রাখে।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

৮. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প: ভারত বিশ্বের অন্যতম খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী দেশ। কিন্তু আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যের ১.৫% আসে ভারত থেকে। তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের তেমন প্রসার হয়নি।

৯. সফট্ওয়ার ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্প: ভারতে সফট্ওয়্যার শিল্পের উন্নতি থেকে বোঝা যায় যে, ভারত তথ্য ও প্রযুক্তিতে উন্নত। ভারতের অর্থনীতিতে সিনেমা, বিজ্ঞাপন শিল্পেরও বিশেষ অবদান রয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে এ ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটেনি। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও ইলেকট্রিক শিল্পেও বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় পিছিয়ে আছে।

১০. রাসায়নিক শিল্প: ভারতের রাসায়নিক শিল্প সংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। এসব শিল্প হতে দেশটি বাণিজ্যিক পণ্য যেমন প্লাস্টিক, প্রসাধনী, কীটনাশক, সার প্রভৃতি উৎপাদন করে থাকে। ভারত বিশ্বের ১৩ তম রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশে বৃহৎ আকারে না হলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের রাসায়নিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করে।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা

সুপারিশমালা (Recommendations)

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ শিল্পের দিক থেকে ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশে রয়েছে সুষ্ঠু নীতিমালা, দক্ষ শ্রমিক, প্রযুক্তি ও কাঁচামালের অভাব। এর ফলে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ প্রায় সবক্ষেত্রেই অনেক পিছিয়ে আছে।

বাংলাদেশে শিল্পের উন্নয়নের জন্য করণীয়:

১. শিল্পবান্ধব আইন প্রণয়ন;

২. কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করতে চাইলে তাকে অবশ্যই যৌথভাবে করতে হবে;

৩. দেশে যে সকল শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর প্রতি নজর দেওয়া;

৪. কৃষি ও কৃষিপণ্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপন;

৫. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে;

৬. মোটরসাইকেল ও মোটর গাড়ি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন;

৭. কম্পিউটার ও হার্ডওয়্যার শিল্প স্থাপন;

৮. ইলেকট্রনিক্স শিল্প স্থাপন;

৯. মোবাইল ও টেলিফোন শিল্প স্থাপন;

১০. ডেইরি শিল্প স্থাপন;

১১. শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

১২. কারখানা যেন বন্ধ না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ১১ শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক

শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক

বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব একটা অগ্রসর নয়। শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পকাঠামো অনুন্নত ও দুর্বল। বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের প্রতি অনেক বেশি উদ্যোগ লক্ষণীয় বলে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই উন্নয়নের গতিধারা চলমান রাখার ক্ষেত্রে শিল্পস্থাপন করা জরুরি। শিল্পস্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো:

১.কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এদেশের প্রধান সমস্যা। যদি অধিক পরিমাণ শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয় তবে বেকার ও স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাবে। ফলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

২. মহিলাদের কর্মসংস্থান: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই নারীদেরকে পেছনে রেখে কখনোই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে যেমন নারীদেরকে কাজে নিয়োগ দেয়া সম্ভব তেমনি পোশাক শিল্পেও রয়েছে নারীর বিশেষ অবদান। নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করলে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, সামাজিক অবকাঠামো উন্নত হবে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু কমানো সম্ভব হবে।

শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক

৩. কৃষকদের অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি: বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশে ৮০%-৮৫% লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষকদেরকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োগ করলে তাদের কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। মৌসুমি ছদ্ম বেকারত্ব হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের যোগানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৪. দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যা শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাঁচামালও এদেশে সহজলভ্য। শিল্প স্থাপনের ফলে বিভিন্ন দেশীয় সম্পদ ব্যবহার সম্ভব হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও সাশ্রয়: শিল্পের প্রসার একদিকে যেমন রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সাহায্য করে তেমনি অন্যদিকে বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণও হ্রাস করে। ফলে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটে, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

৬. সুষম উন্নয়ন: সাধারণত শিল্পকারখানাগুলো শহরাঞ্চলের কাছাকাছি গড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যায় তবে গ্রামেরও উন্নয়ন হবে। সেই সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজে সমগ্র দেশে সরবরাহ করা যাবে। ফলে গ্রামের মানুষের শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মান উন্নত হবে।

শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক

৭. জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করতে হলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাই শিল্প স্থাপন হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতি আরো সুদৃঢ় হবে।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। জাতীয় আয় ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করে শিল্প দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি কৃষির তুলনায় নিশ্চিত ও স্থিতিশীল থাকে। কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য তাই শিল্প স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ।

৯. জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন; শিল্পায়নের ফলে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য সুবিধার উন্নয়ন ঘটে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ফলে জন্মহার ও মৃত্যুহার কমে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে, শিশুদের মৃত্যুর হার কমে। কোনো দেশের জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রিত থাকলে তা উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

১০. সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন: শিল্পায়ন সামাজিক ব্যবস্থাকেও উন্নত করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সমাজ মুক্ত হয় এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পরিণত হয়। সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, উন্নয়নের গতিধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ১২ শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাপন হয়েছে ভোগের ও বিলাসিতার। আজ বিশ্বে কোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পের উন্নয়ন। বিশ্বের কতিপয় দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান) শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে আবার কতিপয় দেশ বিভিন্ন কারণে শিল্পের আশীর্বাদ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ তেমন একটি দেশ যে দেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতন, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও বিপ্লবের ফলে শিল্পায়নের তেমন বিকাশ ঘটতে পারেনি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শোষণ, বৈষম্য, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে এদেশের শিল্প বিকাশ লাভকরতে পারেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিল্পায়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

শিল্পায়ন (Industrialization)

শিল্পায়ন বলতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র একটি প্রাথমিক বা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে মাধ্যমিক, অকৃষিভিত্তিক বা দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা নতুন শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Steven M. Shelfrin তার 'Economics Principles in action' (2003) বইয়ে বলেন,

"Industrialization is the period of social and economic change that transform a human group from an agrarian society into an industrial one" অর্থাৎ শিল্পায়ন হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, যা একটি কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত করে।

শিল্পায়ন মূলত বৃহৎ' আধুনিকায়নের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সামাজিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

৬. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কাঁচবালি ইত্যাদির আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সহজলভ্য উপাদানের সঠিক ব্যবহার ও ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. দক্ষ মানবসম্পদ নির্ধারণ: শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার অনেকাংশে নির্ভর করে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার ওপর। সেক্ষেত্রে অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তি নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে পণ্যের গুণগত মান উন্নত হবে এবং বিশ্বব্যাপী বাজার বৃদ্ধি পাবে।

৮. শিল্পের ভারসাম্য স্থাপন: সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়ক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার ফলে শিল্পের বাজার বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় কীভাবে শিল্পকারখানা সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়।

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

৯. সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন: শিল্পের উন্নয়ন হলে সেই সাথে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এছাড়াও ভালো মানের পণ্য ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে ও উন্নত জীবনযাত্রার দিকে ধাবিত করে। শিল্পের উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে।

১০. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা শিল্পোন্নয়নের অন্যতম শর্ত। বিশ্ব অর্থনীতির তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিল্পের বিকাশ অতীব জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শিল্পায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Political Stability)

১. উৎপাদন প্রক্রিয়া ঠিক রাখা: রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এটি শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করে এবং উদ্যোক্তাকে লোকসানের সম্মুখীন করে।

২. বিদেশী বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে বিদেশি সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় নিয়ামক যোগান দিতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগও এ কারণে নিরুৎসাহিত হয়।

৩. উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী মনোভাবে উৎসাহিতকরণ: রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগে

উৎসাহ পান। অপরপক্ষে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, শিল্পনীতি পরিবর্তন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ১৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশ কোন দেশে সর্বাধিক তৈরি পোশাক রপ্তানি করে?(সকল বোর্ড ২০২৫)

ক. ফ্রান্স খ. কানাডা গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

কোন দেশটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রথম? সকল বোর্ড ২০১৮/

ক. রাশিয়া খ. ভারত গ. চীন ঘ. ব্রাজিল

কার্পাস বয়নশিল্পে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি?

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান গ. ভারত ঘ. চীন

যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে কোন শিল্প বেশি গড়ে উঠেছে? (সকল বোর্ড ২০১৭/

ক. কার্পাস বয়ন খ. লৌহ ও ইস্পাত

গ. তৈরি পোশাক ঘ. ঔষধ প্রস্তুতি

সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়-(সকল বোর্ড ২০২৫।

ক চুনাপাথর খ চীনামাটি গ কঠিন শিল্প ঘ কাঁচবালি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা কোন জেলায় অবস্থিত?(সকল বোর্ড ২০২৩/

ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. কুমিল্লা গ. নরসিংদী ঘ. সিলেট

শিল্প স্থাপনে প্রাকৃতিক নিয়ামক কোনটি? /সফল বোর্ড ২০২৩।

ক. মূলধন খ. শ্রমিক গ. পরিবহন ঘ. জলবায়ু

মধ্য এশিয়ার তুলা উৎপাদক অঞ্চলে কোন শিল্পের প্রসার ঘটেছে?

ক. সুতা খ. কার্পাস বয়ন গ. তৈরি পোশাক ঘ. ফুট

দর্শনার কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলটিতে চিনি ছাড়া আর কী কী উৎপন্ন হয়?

ক. গুড়, চকলেট খ. কোমল পানীয়

গ. বিস্কুট, মদ ঘ. অ্যালকোহল, স্পিরিট

বাংলাদেশের ক্রম অগ্রসরমান শিল্প কোনটি?

ক. জাহাজ নির্মাণ খ. পোশাক

গ. লৌহ ও ইস্পাত ঘ. চা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

- বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোনটি?

ক. ফেঞ্চুগঞ্জ খ. ঘোড়াশাল গ. আশুগঞ্জ ঘ. যমুনা

- ছাতক সিমেন্ট কারখানা কোথায় অবস্থিত?

ক. মৌলভীবাজারে খ. সিলেটে গ. নারায়ণগঞ্জে ঘ. রংপুরে

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে রয়েছে কোন শিল্প?

ক. তৈরি পোশাক খ. কাগজ গ. সার ঘ. পাট

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প গড়ে উঠার মূল'কারণ কোনটি?

ক. শ্রমিকের সহজলভ্যতা খ. স্থানীয় প্রচুর মূলধন

গ. শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সুবিধা ঘ. সরকারি নীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কোন শিল্প?

ক. তৈরি পোশাক খ. চিনি গ. লৌহ ও ইস্পাত ঘ. সিমেন্ট

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – শিল্প

টপিক – ১৪ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতাকে একটি শিল্পের নামে নামকরণ করা হয়। উক্ত শিল্পজাত পণ্য ব্যতীত অন্য শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তাও করা যায় না।

[দি. বো., দি. বো,, কু. বো., চ. বো., সি. বো,, ব. বো. ২০২২]

ক. প্রধান আখ উৎপাদনকারী দেশের নাম উল্লেখ করো।

খ. বাংলাদেশের চিনিকল উত্তরবঙ্গে বেশি- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক নিয়ামক ব্যাখ্যা করো।,

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্পটির ব্যবহারিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' ঢাকার সাভারে একটি শিল্প কারখানায় কাজ করেন। যেখানে শার্ট, প্যান্ট, সুয়েটার ইত্যাদি তৈরি হয়।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো, ২০২২]

ক. লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কাকে বলে?

খ. শিল্পায়নে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প বাংলাদেশে গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে- বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় বিভাগ রাজশাহী এবং রংপুরে একটি শিল্পের বেশ কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। শিল্পটি ঢাকা এবং খুলনা বিভাগেও দেখা যায়। অনুকূল পরিবেশ বিশেষ করে কাঁচামালের অভাবে সিলেট বিভাগে শিল্পটির কারখানা দেখা যায় না।

[ঢা. বো., দি. বো. ২০২৩]

ক. খনিজ সম্পদের সংজ্ঞা দাও।

খ. 'তরল সোনা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্পটি গড়ে উঠার প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক নিয়ামক ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU